8 September, 2024

বণিক বার্তা

আলোকপাত | সৈয়দ আবুল বাশার

অলিম্পিকের স্বর্ণপদকের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

কয়েক বছর ধরে দেখছি, কিছু বিশ্লেষক বিশ্ব অর্থনীতির নানা ঘটনা বোঝাতে অলিম্পিক খেলার সঙ্গে তুলনা টানছেন। এ লেখায় আমি ওই বিশ্লেষকদের ধারণা, বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাদের তুলনা এবং বাংলাদেশের জন্য এর গুরুত্ব নিয়ে কথা বলব।

গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক যেন বিশ্বের দেশগুলোর শক্তি আর প্রভাবের একটা বড় আয়না। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমেরিকা ও চীন পদক তালিকায় এক নম্বর ও দুই নম্বরে থাকছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে এ দুই দেশের দাপটেরই ইশারা দেয়। ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক ছিল একটু অন্য রকম। কারণ এটা শুধু খেলার মাঠেই নয়, বরং গোটা বিশ্বের অর্থনীতি আর রাজনীতিতেও বেশ নাড়া দিয়েছে।

চীনের অলিম্পিক যাত্রা ও তার অর্থনৈতিক উত্থানের সঙ্গে একটা মজার মিল আছে। ১৯৮৪ সালের অলিম্পিকে চীন প্রথম পদক পায়। এর পর থেকে চীন যেন রকেটের গতিতে এগিয়েছে, ঠিক যেভাবে তার অর্থনীতিও বছরে ১০ শতাংশ হারে ফুলেফেঁপে উঠেছে। মাত্র ২৫ বছর পর ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে চীন আমেরিকাকে টপকে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণপদক জিতে নেয়।

২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে আমেরিকা ৩৯টি এবং চীন ৩৮টি স্বর্ণপদক জিতেছিল। এই কাঁটায় কাঁটায় লড়াই যেন দুই দেশের মধ্যকার বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতারই একটা ছোট্ট ঝলক। সাম্প্রতিক প্যারিস অলিম্পিকে আমেরিকা ও চীন দুই দেশই ৪০টি করে স্বর্ণপদক জিতেছে। তবে মোট পদকের হিসাবে আমেরিকা ১২৬টি পদক জিতে এগিয়ে থাকে আর চীন জিতেছে ৯১টি।

ইউরো জোন হেজ ফান্ডের পরিচালক স্টিফেন জেন একটা দারুণ কথা বলেছেন। তিনি বলছেন, আমরা যদি 'বৃহত্তর চীন'-এর কথা ভাবি অর্থাৎ চীন, হংকং ও তাইওয়ান একসঙ্গে। তাহলে দেখা যাবে এ অঞ্চল মোট ৪৪টি স্বর্ণপদক জিতেছে, যা আমেরিকার ৪০টা স্বর্ণপদকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা যেন সাম্প্রতিক সময়ে প্রথমবারের মতো আমেরিকাকে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে পেছনে ফেলে দেয়া।

অন্যদিকে ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর সম্মিলিত পারফরম্যান্স চোখে পড়ার মতো। এ দেশগুলো মিলে মোট ৮৪টি স্বর্ণপদক জিতেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের যৌথ সংখ্যার সমান। আর মোট পদকের হিসাবে তো ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্মিলিত সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ পরিসংখ্যান ইউরোপের সম্মিলিত শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতিফলন, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৮০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত চীন যে রকেটের গতিতে এগিয়েছে, ইতিহাসে এমন দ্রুত ও বহুমুখী উন্নতি খুব কম দেশে দেখা গেছে। এ দ্রুত ও বহুমাত্রিক উন্নতির ফলে চীন আজকে বিশ্বের একমাত্র মহাশক্তি আমেরিকার একজন গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। সাবেক চেক প্রেসিডেন্ট ভাক্লাভ হাভেলের কথায়, এসব এত দ্রুত ঘটেছে যে আমরা এখনো বিস্মিত হওয়ার সময় পাইনি। এ প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রাহাম অ্যালিসন 'দ্য গ্রেট রাইভালরি : চায়না ভার্সেস দ্য ইউএস ইন দ্য ২১ সেঞ্চুরি' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় দেখিয়েছেন ২০ বছর আগে যে দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেছনের দিকে খুঁজে পেত, সেই দেশ এখন তাদের পাশাপাশি বা কিছু ক্ষেত্রে একটু এগিয়েও রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের (ব্রিটেন) ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়। দেশটি আধুনিক অলিম্পিকে বেশ কয়েকবার পদক তালিকায় তৃতীয় স্থান কিংবা ওপরের সারিতে অধিকার করেছে, যা তাদের দেশের আকারের তুলনায় একটি সাফল্যের নিদর্শন। তবে যুক্তরাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কারণে ভবিষ্যতে ভালো পারফরম্যান্স নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিরতা কতটা জরুরি।

নরওয়ের গল্পটা আরো মজার। মাত্র পাঁচ মিলিয়ন জনসংখ্যা সত্ত্বেও নরওয়ে বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরি করেছে। নরওয়ের কৃতিত্ব দেখিয়ে দেয় যে সঠিক পরিকল্পনা আর বিনিয়োগ থাকলে ছোট দেশও বড় সাফল্য পেতে পারে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে—ছোট দেশও নির্দিষ্ট খাতে পারদর্শী হয়ে বিশ্ববাজারে নাম কুড়াতে পারে। ইতালি ও জাপানের সাম্প্রতিক সাফল্য অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট যেমন পুরুষদের ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার রিলে এবং হাই জাম্পে দেখায় যে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মাধ্যমে যেকোনো দেশই বিশ্বমানের সাফল্য অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরে ভারতের অলিম্পিক পারফরম্যান্স তার বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। এটি দেখায় যে শুধু জনসংখ্যা নয়, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও বিনিয়োগও প্রয়োজন। এ পাঠ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ আর শ্রমিক থাকলেই হয় না, দরকার দক্ষতা বাড়ানো আর বুদ্ধি খাটিয়ে পরিকল্পনা করা।

অলিম্পিকে দেশগুলোর পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সাফল্য অর্জন করছে। স্টিফেন জেনের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রীড়া ক্ষেত্রে 'বটম-আপ' পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেখানে বেসরকারি উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ প্রতিভাকে স্বাভাবিকভাবে এবং নিজ থেকেই শীর্ষে উঠতে সাহায্য করে। অন্যদিকে চীন 'টপ-ডাউন' পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেখানে সরকারি পরিকল্পনা ও নির্দেশনা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। চীন দেশজুড়ে এমন তিন বছর বয়সী শিশুদের খুঁজে বের করে যারা ১৫ বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। উভয় পদ্ধতিই সাফল্য অর্জন করেছে, যা দেখায় যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেলও সফল হতে পারে, যদি তা দেশের বাস্তবতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

শিল্প নীতির (ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি) ক্ষেত্রে অলিম্পিকের সঙ্গে তুলনা টানা যায়। ঠিক যেভাবে দেশগুলো অলিম্পিকে নির্দিষ্ট ইভেন্টে মনোযোগ দেয়, তেমনি তারা নির্দিষ্ট শিল্প খাতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে। যুক্তরাজ্যের সাইক্লিং, রোয়িং, নৌকাবাইচ ইত্যাদিতে সাফল্য এর একটি চমৎকার উদাহরণ। উল্লেখযোগ্য যে এই ইভেন্টগুলো ক্রীড়াবিদরা সাধারণত বসে খেলেন। এ কৌশল অর্থনীতিতেও প্রয়োগ করা যায়, যেখানে দেশগুলো তাদের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে এমন খাতগুলোয় বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সরকার পরিচালিত বিনিয়োগ কৌশলের একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন' এবং 'চিপস ও বিজ্ঞান আইন' প্রণয়ন করেছে, যার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে চীন 'মেড ইন চায়না ২০২৫' এবং 'চায়না স্ট্যান্ডার্ড ২০৩৫' কৌশল গ্রহণ করেছে। অন্যান্য দেশও এ ধরনের নীতি গ্রহণ করছে বা করার কথা বিবেচনা করছে।

এ প্রবণতা অলিম্পিকের জন্য দেশগুলোর প্রস্তুতির সঙ্গে তুলনীয়, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'শিল্প অলিম্পিক' ধারণাটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, যেখানে দেশগুলো নির্দিষ্ট শিল্প খাতে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি কার্যকর হতে পারে। যদি কোনো দেশ শিল্পনীতি বাস্তবায়নে দক্ষ না হয়, তাহলে তাদের উচিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উন্নত করার চেষ্টা করা। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার জন্য দেশগুলোর উচিত তাদের সম্পদ ও প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট শিল্প খাতে কেন্দ্রীভূত করা, যেখানে তারা নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে।

তবে এ ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ নানা চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করে। যেমন অলিম্পিক আয়োজনের উচ্চ ব্যয় ও পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে বাজার বিকৃতির সম্ভাবনাও রয়েছে। সঠিক বাস্তবায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। সিঙ্গাপুরের স্কি জাম্পিংয়ে বিনিয়োগ যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক শিল্প খাতে সরকারি বিনিয়োগও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অকার্যকর হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য এ বিশ্লেষণ থেকে বেশকিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নরওয়ে নির্দিষ্ট কিছু ক্রীড়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছে, তেমনি বাংলাদেশও তার তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে এমন খাতগুলোয়। যেমন তৈরি পোশাক শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাত বা আইটি সেবা বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের 'বটম-আপ' এবং চীনের 'টপ-ডাউন' পদ্ধতির সফলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ একটি সমন্বিত মডেল গ্রহণ করতে পারে যেখানে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বেসরকারি খাতের উদ্যোগ ও নবাচারকে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলাদেশ তার নিজস্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এমন একটি মডেল তৈরি করতে পারে, অথবা এ দুইয়ের মাঝামাঝি একটি কৌশল বেছে নিতে পারে যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে সহায়ক হবে। যেমন এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে তা শুধু জ্ঞান বিতরণ নয়, বরং দক্ষতা উন্নয়ন, সৃজনশীলতা এবং নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সক্ষমতাও বৃদ্ধি করে।

তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক বিনিয়োগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অলিম্পিক সাফল্যের জন্য যেমন বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুতি ও অনুশীলন প্রয়োজন তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো এদিক থেকে একটি ভালো উদাহরণ, তবে এর বাস্তবায়ন ও ফলাফল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আরো জোর দেয়া প্রয়োজন।

চতুর্থত, ছোট দেশও (যেমন নরওয়ে) বড় সাফল্য অর্জন করতে পারে—এটি বাংলাদেশের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। আয়তন বা জনসংখ্যার চেয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ তার বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজের অবস্থান মজবুত করতে পারে।

পঞ্চমত, ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া যায়, শুধু বিশাল জনসংখ্যা বা প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেই সাফল্য আসে না। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যেখানে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

অলিম্পিক ও বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে বেশকিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুটো ক্ষেত্রেই লাগে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সঠিক বিনিয়োগ আর নিজের শক্তিকে কাজে লাগানোর দক্ষতা। বাংলাদেশের জন্য এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে, বিশেষ করে কোন ক্ষেত্রে সেরা হওয়া যায় সেটা বের করে সেখানে মনোযোগ দেয়া এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের মিলিত প্রচেষ্টা। তবে তুলনাটা সব ক্ষেত্রে খাটে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এর সঙ্গে জড়িত সহযোগিতা, টেকসই উন্নয়ন আর সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো জটিল বিষয়।

অলিম্পিক একটা দেশের সংগঠনক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়। একজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরি করা মোটেও সোজা কাজ নয়। যে দেশগুলো সবচেয়ে বেশি পদক জেতে, তাদের অর্থনীতিও প্রায়ই খুব শক্তিশালী বা অন্তত সুসংগঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কমে যাওয়া নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। একসময় তারা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে দাপট দেখাত, কিন্তু এখন অনেক দেশই তাদের খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ফলে আমরা আরো বেশি দেশ থেকে কড়া প্রতিযোগিতা দেখছি। কিন্তু বিশ্ব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাড়াটা খারাপ কিছু নয়। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনকেও বোঝায় না।

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ হলো এ শিক্ষাগুলোকে কাজে লাগানো, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের নিজস্ব পরিস্থিতি ও চাহিদা মাথায় রাখা। এর জন্য দরকার নমনীয় নীতি, নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এভাবেই বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক 'অলিম্পিকে' সাফল্য পেতে পারে যা শুধু সংখ্যায় নয়, মানুষের জীবনমানেও দেখা যাবে।

অলিম্পিক ও বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে বেশকিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুটো ক্ষেত্রেই লাগে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সঠিক বিনিয়োগ আর নিজের শক্তিকে কাজে লাগানোর দক্ষতা। বাংলাদেশের জন্য এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে, বিশেষ করে কোন ক্ষেত্রে সেরা হওয়া যায় সেটা বের করে সেখানে মনোযোগ দেয়া এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের মিলিত প্রচেষ্টা। তবে তুলনাটা সব ক্ষেত্রে খাটে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এর সঙ্গে জড়িত সহযোগিতা, টেকসই উন্নয়ন আর সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো জটিল বিষয়। অলিম্পিক একটা দেশের সংগঠনক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়। একজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরি করা মোটেও সোজা কাজ নয়। যে দেশগুলো সবচেয়ে বেশি পদক জেতে, তাদের অর্থনীতিও প্রায়ই খুব শক্তিশালী বা অন্তত সুসংগঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কমে যাওয়া নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। একসময় তারা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে দাপট দেখাত, কিন্তু এখন অনেক দেশই তাদের খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ফলে আমরা আরো বেশি দেশ থেকে কড়া প্রতিযোগিতা দেখছি। কিন্তু বিশ্ব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাড়াটা খারাপ কিছু নয়। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনকেও বোঝায় না।

সৈয়দ আবুল বাশার : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি।